আকাশ কটাক্ষ নিয়ে ভাবনা

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

‘খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথার কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুখ অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।’- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের সূচনা এভাবেই।

এই ‘আকাশ দেবতার কটাক্ষ’- বজ্রপাত, আজ এক গভীর ভাবনার বিষয়। যে কটাক্ষে চলতি মাসেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন হারুকে হারাতে হয়েছে, আহত হয়েছেন অনেকে। আকাশে কালো মেঘের ছড়াছড়িতে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও অনেকে মাছ ধরতে বা ক্ষেতে কাজ করতে যায়। বিপদে তারা খোলা মাঠে দিশেহারা হয়ে পড়ে বা কোনো গাছের নিতে আশ্রয় নেয়, যা বজ্রপাতের কবলে পড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বজ্রপাত কোন ব্যক্তির উপর সরাসরি পড়তে পারে অথবা একটি বড় এলাকা জুড়েও হতে পারে। বজ্রপাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বজ্রপাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য কোনো প্রটোকল নেই। বজ্রপাতে আহত কাউকে কী চিকিৎসা দেওয়া হবে সেটাও বেশির ভাগ মানুষের জানা নেই।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ঝড়, বন্যা ও বজ্রাঘাতপ্রবণ অঞ্চল। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে বছরে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়। বিশ্বে বজ্রপাতের প্রায় ২৫ ভাগ মানুষ প্রাণ হারায় বাংলাদেশে। ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা- সব মিলিয়ে যেন বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির আদর্শ পরিবেশ এ দেশের বায়ুমণ্ডল। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে দুই ধরনের বজ্রপাত হয়। মেঘ থেকে আরেকটি মেঘে এবং অপরটি মেঘ থেকে ভূমিতে, যার কারণেই জানমালের ক্ষতি বেশি হয়।

দেশের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, পাবনা, নঁওগা, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, জামালপুর, গাইবান্ধা ও টাঙ্গাইল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ জেলা। এই ১৫ জেলায় মৃত্যুও বেশি। এর মধ্যে মার্চ-এপ্রিল ও মে মাসে বজ্রপাত বেশি হয় হাওরাঞ্চলে- কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও নেত্রকোনা জেলায়। জুন, জুলাই, আগস্টে হয়ে থাকে সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও বরিশালে। অন্যদিকে কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়েও বজ্রপাত বেশি হয়। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কক্সবাজারে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের তথ্য সফটওয়্যারে প্লটিং করে বাংলাদেশের একদল গবেষক দেখেছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্ব ও সরাসরি উত্তর-পূর্ব কোণাকুণি এলাকা অর্থাৎ সুনামগঞ্জ-সিলেট অঞ্চলে অধিকাংশ বজ্রপাত হচ্ছে।

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বজ্রপাতকে আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বুয়েট, দুর্যোগ ফোরাম, গণমাধ্যমের তথ্য ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসাবমতে, গত ছয় বছরে সারা দেশে বজ্রপাতে সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। বজ্রপাতের মাত্রা এবং মৃত্যুর সংখ্যা বিবেচনা করে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার এটিকে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

দুঃখজনক সত্যটি হলো, বাংলাদেশে বজ্রপাতের ওপর তেমন কোনো গবেষণা নেই। তবে ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকায় এ বিষয়টি নিয়ে বড় গবেষণা চলছে। আমেরিকান মেট্রোলজিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ ‘লাইটিং ফ্যাটালিটিস ইন বাংলাদেশ ফ্রম ১৯৯০ থ্রু ২০১৬’-এ দেখানো হয়েছিল, ঐ ২৬ বছরে বজ্রপাতে মারা গিয়েছে ৩ হাজার ৮৬ জন। যার মধ্যে ৯৩ শতাংশই গ্রামের এবং কৃষক। বর্ষার শুরুর দিকে মৃত্যু হয় সবচেয়ে বেশি (৬২ শতাংশ) । বর্ষার মধ্যবর্তী সময়ে ৩৩ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে সকাল ও দুপুরে। কারণ, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতকে উপেক্ষা করে এ দেশের লোকজন খোলা জায়গায় কাজ করে। বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়। আকস্মিক এ দুর্যোগের সময় দ্রুত সরে যাওয়ার নিরাপদ স্থান না থাকায় মাঠেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংগঠন ‘ডিজাস্টার ফোরাম’-এর তথ্যমতে, কৃষিকাজের সময় ৭০ শতাংশ, সাড়ে ১৪ শতাংশ বাড়ি ফেরার পথে এবং পুকুরে বা নদীতে ১৩ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে। তবে শহরের ভবনগুলোয় বজ্রপাত প্রতিরোধক দণ্ড থাকায় হতাহতের সংখ্যা কম।

সাম্প্রতিক সময়ে অস্বাভাবিক হারে বজ্রপাত বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার ধরন পরিবর্তন, জলীয়বাষ্পের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, আকাশে কালো মেঘের পরিমাণ ও মেঘে মেঘে ঘর্ষণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বেশি দায়ী করেছেন। পাশাপাশি বৃক্ষনিধনের ফলে উঁচু গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, বন উজাড়, মোবাইল ফোন ব্যবহার ও টাওয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বড় ভূমিকা রাখছে বলেও তাঁরা মনে করেন।

আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাপমাত্রা যত বাড়ে, বজ্রপাতও তত বাড়ে। তাপমাত্রা গড়ে এক ডিগ্রি বেড়ে গেলে বজ্রপাত ১০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি বেড়ে যায় বলে ধারণা করা হয়।

বজ্রপাত থেকে রক্ষায় সচেতনতার বিকল্প নেই। বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য প্রথম কাজ হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হওয়া। পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষনিধন রোধসহ নিয়মিত বৃক্ষ রোপণে সচেষ্ট থাকতে হবে। একটি গাছ কাটলে অন্তত পাঁচটি চারাগাছ রোপণ করার যে শ্লোগান দেয়া হয়, তাকে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। বাড়ির আশেপাশে, রাস্তার উভয় পাশে, উন্মুক্ত স্থানে সুপারি, নারিকেল, তাল জাতীয় গাছ লাগাতে হবে।

গ্রামের মানুষ বজ্রপাত বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদে থাকতে কিছু করণীয় পরামর্শ মেনে চলার জন্য বলছেন আবহাওয়াবিদরা। এগুলো হলো- বিদ্যুৎ চমকালে খোলা প্রান্তরে না থেকে ঘরের ভেতরে থাকতে হয়। বজ্রপাতের সময় পাকা বাড়ির নিচে আশ্রয় নিতে হবে এবং গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ধাতব হাতলযুক্ত ছাতার পরিবর্তে প্লাস্টিক হাতলযুক্ত ছাতা ও রাবারের জুতা ব্যবহার করা উচিত। বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসিসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে বৈদ্যুতিক সকেট থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। এ সময় বারান্দার ধাতব গ্রিল স্পর্শ করা উচিত না। রান্নাঘর বা টয়লেটের পানির ধাতব কলের মুখসহ অন্যান্য ধাতব পাইপ থেকেও দূরে থাকতে হবে। ভবন নির্মাণ কাজের সময় তামার তারের মাধ্যমে আর্থিং করিয়ে নেয়া উচিত।

এবার প্রাতিষ্ঠানিক করণীয় নিয়ে বলি। আবহাওয়া জরিপের মাধ্যমে দেশের বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলো শনাক্ত করে 'বজ্রপাত নিরাপত্তা বলয় জোন' স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া উচিত। বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃষক যেন অল্প সময়ে নিরাপদ স্থানে যেতে পারে সেজন্য প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও বজ্রপাতনিরোধক স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। এসব এলাকায় মুঠোফোনের টাওয়ারে বজ্রপাতনিরোধক লাগিয়ে বজ্রপাতের ঝুঁকি কমানো যেতে পারে। মুঠোফোন কোম্পানিগুলো তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে কাজটি করতে পারে। পল্লী বিদ্যুৎ ও সীমান্তরক্ষীদের সব স্থাপনায় কমবেশি এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বজ্রপাতে আগে বছরে ৪০০ থেকে ৪৫০ জন নিহত হতো, সেখানে এখন মারা যায় ২০ থেকে ৪০ জন। বজ্রপাতের ঝুঁকি মোকাবিলায় সারা দেশে তালগাছের ৫০ লাখ চারা রোপণের উদ্যোগকে শেষ করতে হবে।

সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচারের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের তৎপর থাকতে হবে। মোবাইল মেসেজ ও রেডিওর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করতে পারলে মৃত্যুর ঘটনা কমবে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিওগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বজ্রপাতের প্রকোপ বেশি, এই সময় বেশি বেশি প্রচার, সতর্কীকরণ, সামাজিক সভা ও মাইকিং করতে হবে। তবে সহজ ভাষায় আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্ক বার্তা প্রচার করার দিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, গ্রামের সাধারণের পক্ষে আবহাওয়ার গতানুগতিক কেতাবি পূর্বাভাস বোঝা বেশ কঠিন।

বজ্রপাতে প্রাণহানি ঠেকাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন মেয়াদের পৃথক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। 'হাওরাঞ্চলে কৃষকদের জীবনের সুরক্ষায় বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ২৩ জেলায় 'লাইটার অ্যারেস্টার' সংবলিত বজ্রপাত-নিরোধকসহ কংক্রিটের ছাউনি বা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করবে। এখানে লোকজন নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই 'লাইটার অ্যারেস্টার' প্রযুক্তি আছে। প্রাথমিকভাবে হাওর এলাকায় ১ হাজার বজ্রপাত-নিরোধক নির্মাণ করা হবে। থাকবে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম, যা বজ্রপাতের ৪০ মিনিট আগেই সংকেত দিবে। মোবাইলের মাধ্যমে এ সতর্কবার্তা মাঠের কৃষকসহ সবার কাছে পৌঁছে যাবে। ইতোমধ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে এ ধরনের ছোট ছোট কয়েকটি ছাউনি করা হয়েছে। এখন হাওরেও হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয় পাইলট আকারে হাওর এলাকার চারটি উপজেলায় ১৬টি 'আর্লি স্টিমার ইমিটার (ইএসই)' নামক বজ্রনিরোধক স্থাপন করবে। পরে আরো হাওরের তিন জেলায় তা সম্প্রসারিত হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা জনসচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করছে। হাওরাঞ্চলে স্থাপিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ নেটওয়ার্ক থেকে পাওয়া সেন্সরভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় 'ক্লাউড টু গ্রাউন্ড' এবং 'ক্লাউড টু ক্লাউড লাইটনিং ডিটেকশন সিস্টেম'- যা মোবাইল অ্যাপ, মোবাইল ভয়েস ও টেক্সট মেসেজের সাহায্যে কৃষকদের সতর্ক করবে।

বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সুরক্ষার জন্য 'পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)' ১৯৯৬ সাল থেকে সঞ্চালন লাইনে গ্রাউন্ড-ওয়্যারের পরিবর্তে অপটিক্যাল গ্রাউন্ড ওয়্যার (ওপিজিডব্লিউ) প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭ হাজার ৩৭৭ কিলোমিটারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

যত উদ্যোগই নেয়া হোক না কেন, বজ্রপাত থেকে মৃত্যু কমাতে সচেতনতাই প্রথম অবলম্বন। সচেতনতা গড়ে তুলতে গণমাধ্যম, জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে হবে।

#

লেখক: তথ্য অধিদফতরে সিনিয়র তথ্য অফিসার হিসেবে কর্মরত

পিআইডি ফিচার